তৃতীয় অধ্যায়

বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতায় প্রেমচেতনা

প্রেম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল : প্রিয় + ইমন্ = প্রেমন →প্রেম। আভিধানিক অর্থ[১] 'সৌহার্দ্য, স্নেহ, ভালোবাসা' মানবজীবনের মৌলিক এবং প্রবল অনুভূতিই প্রেম। জীবনের প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। তাই কাব্যে প্রেমের ভূমিকা উপস্থিত। মানুষের অন্যান্য অনুভূতির মতো প্রেম জটিল ও স্ববিরোধীতায় পূর্ণ। এর স্পর্শে মানুষ নিজেকে খুঁজে পায়। আবার প্রেমের বেদনা মানুষকে রিক্ত, নিঃস্ব করে দেয়। প্রেম ভেতর থেকে মানুষকে বাইরে নিয়ে যায়[২], নিজের থেকে অন্যের দিকে নিয়ে যায়। প্রেম পথের আলো, পথ চলতে প্রেমের প্রয়োজন অবশ্যই।

প্রেম একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি।[৩] তবুও সমাজসত্তার দ্বারা এই অনুভূতি প্রভাবিত ও রূপায়িত হয়। এতে আছে কখনও রোমান্টিকতা, কখনও বা তীব্র বাসনার শরীরী সংরাগ। আবার অপার্থিব দেহাতীতের রোমান্টিকতাও আছে প্রেমে। কখনও আছে শুধুই স্থূলতা, কখনও জীবনের বিচিত্র জটিলতা। সকলের সহ অবস্থানে প্রেম পঙ্কজ। মানব চিত্তবৃত্তির প্রবল ও শ্রেষ্ঠ অনুভূতিই প্রেম।

প্রেমতত্ত্বে আছে জীবনের রঙিন স্বপ্ন, সুখতৃপ্তি। জীবনের রোমান্স, রহস্যময়তা, আনন্দ, উল্লাস, সূক্ষ্মতা, জটিলতা ও মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রেমে। নরনারীর জৈবিক প্রবৃত্তি হল স্বভাবগত আকর্ষণ ও মিলনের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা। প্রেমের উৎস যে শুধু জৈবিক প্রবৃত্তি তা নয়। সেখানে বিশেষ নারীর প্রতি বিশেষ পুরুষের বা বিশেষ পুরুষের প্রতি বিশেষ নারীর চিত্তাকর্ষণও ঘটে। আর এই আকর্ষণের 'একনিষ্ঠতা ও অনন্যতার ফলে' চিত্তব্যাকুলতার এবং মিলন আকাঙ্ক্ষার জন্য যে অন্তর্দাহ তার প্রকাশ ঘটে। বলা বাহুল্য প্রেমের প্রকৃত সার্থকতা গতিশীলতায়[৪]।

প্রেম একটা আবেগ। এই আবেগ সবার মধ্যে আছে। প্রত্যেক কবিই প্রেমের কবিতা লেখেন। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যও প্রেমের কবিতা লেখেছেন। তবে তাঁর কবিতায় প্রেম একঘেয়ে নয়। আবার একজন কবি যে আবেগ নিয়ে প্রেমকবিতা লেখেন কবি কিন্তু তাও নন। আবেগকে তিনি ব্যক্তিপ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সমষ্টির মধ্যে চারিয়ে দিয়েছেন।

নৈর্ব্যক্তিকতাই তাঁর অন্যতম পাথেয়। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত শিল্প সাহিত্যে যত প্রেমের প্রসঙ্গ এসেছে তাঁকে তিনি আত্মস্থ করেছেন এবং সেই চেতনা তাঁর প্রেমের কবিতায় স্ফুরিত। প্রেম ব্যক্তিগত ও বস্তুনিষ্ঠ। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের প্রেম বস্তুনিষ্ঠ (Objective)। ব্যক্তিপ্রেম তাঁর কবিতায় এসেছে। তবে তাকে বহুত্বের মধ্যে চারিয়ে দিয়েছেন। এ ধরনের প্রেমের অনুভব মুদ্রিত করেছেন তাঁর 'কোনো কবিতার বইয়ের ভূমিকার বদলে' কবিতায় :

"কখনও কেউ পড়বে না জানি, তবু কেন যেন মনে হয় কারও হাতে গিয়ে পড়বে।
হয়তো দু আঙুলে তুলে নেবে একজন, ঢেউ দিয়ে খুলে ফেলবে একপাতা : তোমাকে
দিলাম, তুমি আমার কবিতা।' দ্যাখো তো কবেকার কোন কথা, কোন মানে হয়
এইভাবে মনে করানোর।' করুণায় হেসে উঠবে সে, ভুরু কুঁচকে ফেলবে ভুল করে :
'কত ধরণের যে মানুষ আছে, কিরকম যে তাদের ধারণা। আর, লিখবেই বা কী দিয়ে,
সোনার দোয়াতকলম তো নেই, সেসব জানে সমালোচকেরা।'

তার সমবেদনাও হতে পারে একটু : আহা, আজ আর কারুর হাত নেই, এমন
বাড়াবাড়ি করতে শিখিয়েছিলাম আমিই ওকে, আর সেই থেকে ঘন্টার মতো বাজিয়ে
দিয়েছে ও আমার নাম, প্রতিধ্বনি নামিয়ে দিয়েছে কান্নার দেওয়ালে খেয়াল হলো
আমার একদিন, হিল-তোলা জুতোর নিচে ডুবে গেছে তার উঁচু মুখ, ক্ষমার মতো লাল
হয়ে আছে গোধূলিবেলা, সব আলো গাছের আড়ালে মুছে গেছে, আবছা লতা ডাল
সরিয়ে কাছে এল সে, রোগা আর ফরসা। আরো সাদা হয়ে ফিরে গেল সে, একদিন ও
মিলিয়ে গেল কোথায়....'

'তাও ভাবি, হয়তো কবিতার বই পড়ে এখনও, এরকমই সব ভালোবাসার কবিতা,
আর আমারই কথা ভাবে আরও বেশি করে।'
তার কথাই, তবু, এভাবেও কী কিছু লেখা যায়[৫]।'

('কোনো কবিতার বইয়ের ভূমিকার বদলে', 'অগ্রন্থিত কবিতা')

রোমান্টিক তরুন কবি আর্নস্ট ডাউসন তাঁর কিশোরী প্রেমিকা আদেলেদকে একটি কবিতার বই উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর প্রেমিকা কখনোই এই বই পড়বেন না। তবুও তিনি এ গ্রন্থ তাঁর প্রেমিকার উদ্দেশে অর্পণ করেন। হয়তো রোমান্টিক তরুণ কবি আর্নস্ট ডাউসনের এই ঘটনা এ কবিতা লেখার কালে কবির স্মৃতিতে ছিল।

জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন 'কুড়ি বছর পরে' কবিতা, সেখানে কুড়ি বছর পরে যদি মেঠো পথে আবার দেখা হয় বন্ধু বা প্রেমিকার সঙ্গে তাহলে যে পরিস্থিতি ঘটবে তার সঙ্গে এই কবিতার আংশিক মিল আছে। এ মিল যদি বইটা প্রেমিকার হাতে পড়ে। অর্থাৎ কবি জীবনানন্দ নিজের দিক থেকে দেখেছেন। কবি বীতশোক ভট্টাচার্য দেখেছেন উল্টো অর্থাৎ প্রেমিকার দিক থেকে। যদিও দুটি কবিতাতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছড়ানো আছে। এ কবিতায় ব্যক্তি কবি যেন একজন নিম্নবর্গীয় মানুষ। এই নিম্নবর্গীয় মানুষদের ব্যক্তিজীবনের কোনো মূল্য নেই; পৃথিবীর সমস্ত কবিই এরকম একটা বিষাদময়তায় ভোগেন। সেই বিষাদ ধরা পড়েছে :

'সব আলো গাছের আড়ালে মুছে গেছে, আবছা লতা ডাল
সরিয়ে কাছে এল সে, রোগা আর ফরসা।
আরো শাদা হয়ে ফিরে গেল সে, একদিনও
মিলিয়ে গেল কোথায়...'

এখানে আছে কবি জীবনানন্দের স্মৃতি :

"হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে
সরু সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,
শিরীষের অথবা জামের,
ঝাউয়ের — আমের;
কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে।[৬]"

'কখনও কেউ পড়বে না জানি, তবু কেন যেন মনে হয় কারও হাতে গিয়ে পড়বে'। — 'কেউ পড়বে না' জেনেও কবি 'কবিতার বইয়ের ভূমিকা'র পরিবর্তন করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে কোনো না কোনো জনের কাছে এ কবিতা একদিন উপস্থিত হবে। পরবর্তীকালে কবিতা পাঠও হবে।

'হয়তো দু আঙুলে তুলে নেবে একজন, ঢেউ দিয়ে খুলে ফেলবে একপাতা : 'তোমাকে দিলাম, তুমি আমার কবিতা' — কোনো একজন কবির মানসী প্রিয়া, অনামিকা, কবিদের স্বভাব প্রেমিকের, তাঁদের মধ্যে একজন মানসী বাস করে, যে কবির কল্পিত প্রেমিকা। কবি বীতশোক ভট্টাচার্য উৎসর্গ পত্র লিখছেন তাঁর মানসী প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে :

'তোমাকে দিলাম, তুমি, আমার কবিতা।' বলেছেন এই প্রেরিত কবিতাকে দু'আঙুল দিয়ে

তুলে আন্তরিক আবেগ নিয়ে খুলে ফেলতে। স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন বিস্মৃত ভালোবাসার দিনগুলি।

'দ্যাখো তো, কবেকার কোন কথা, কোনো মানে হয় এইভাবে মনে করানোর'। — কোনো একসময় ব্যক্তিপ্রেম হয়তো প্রস্ফুটিত হয়েছিলো। তবে আজ তা স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। পুনরায় পুরোনো প্রসঙ্গ মনে করার অর্থ যুক্তিহীন বলে প্রেয়সী মনে করে। কারণ স্মৃতি তো বেদনার, যন্ত্রণার। তাকে নতুন করে আহ্বান না জানানোই শ্রেয়।

'করুণায় হেসে উঠবে সে, ভুরু কুঁচকে ফেলবে ভুল করে; 'কতো ধরনের যে মানুষ আছে, কিরকম যে তাদের ধারণা। আর লিখবেই বা কী দিয়ে, সোনার দোয়াত কলম তো নেই, সে সব জানে সমালোচকেরা।' — কুঁচকানো ভুরু, দয়া আর করুণাভরা হাসি নিয়ে প্রেয়সী মনে করবেন পৃথিবীতে নানা ধরণ ও বিভিন্ন ধারণার কথা। ভাববেন লেখার প্রসঙ্গ নিয়ে। এখানে সমালোচনা করেছেন প্রেমিকা নিজেই। কেননা কবিগণ তো নিম্নবর্গীয়। এই নিম্নবর্গীয়দের সমালোচনা করবেন পণ্ডিত সমালোচকগণ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কবির ভাবনা প্রেয়সী তার জন্য হতে পারেন সমব্যথী। কিন্তু তখন তিনি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে গেছেন। অবশ্য তার জন্য দায়ী কবি নিজেই। সমস্ত বিষয়ে অতিরিক্ত ভাব আনতে শিখিয়েছিলেন তিনি নিজেই তা এই লেখার মধ্যে স্বীকৃত। মন্ত্রের মত জপ করেছেন একই নাম ধরে। ঘন্টার ধ্বনিতে বেজে উঠেছে ওই নাম। ধ্বনি দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এসেছে কান্নার রূপ নিয়ে। হঠাৎই কবির ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে। খেয়াল হয়েছে সেই দিনগুলি তাঁর কাছে আজ অতীত। সুন্দর গোপন মুহূর্তগুলি আর নেই। ডুবে গেছে কবিপ্রিয়ার উঁচু মুখ তারই 'হিল তোলা জুতোর নিচে'। বেলা শেষ হতেই যেন শেষ হয়ে যায় খেলা। তবুও প্রেমিকাকে তিনি অসম্মান করেননি। ক্ষমাসুন্দর চোখে প্রেয়সীর মুখখানাকে কবি দেখেন গোধূলিবেলার মতো লাল। সূর্যাস্তের মুহূর্তে সিন্দুরের মত লাল রং ধারণ করে 'গোধূলিবেলা'। সারাদিনের উজ্জ্বল আলো তার ঝলমলে রূপ হারিয়ে ফেলে সূর্যাস্তের সময়। তার পরেই নামে অন্ধকার। গাছের আড়ালে মুছে যায় সব আলো। গাছের আড়ালে মুছে যাওয়া আলোকে কবি তুলনা করেছেন রোগা আর ফরসার সঙ্গে। লতাডাল সরিয়ে প্রেয়সী কবির মুখোমুখি দাঁড়ালে তাকে তিনি দেখেছেন 'রোগা আর ফরসা'। তারপর ফিকে হয়ে একদিন কোথায় হারিয়ে যায়।

গদ্যভঙ্গীতে লেখা কবির ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখকষ্টের ছায়া এ কবিতার মধ্যে পড়তে পারে। স্মৃতিচারণা করেন তিনি। এক সময়ের গাঢ় গভীর ভালোবাসা আজ ধীরে ধীরে দূর্বল হয়ে ফিকে হয়ে যায়। তবুও তিনি ভাবেন তাঁর মানসীপ্রিয়া এখনো কবিতা পাঠ করে হয়তো বা, যে কবিতার ধরণ ভালোবাসার, আর কবিরই কথা ভাবে।

এখানে দীর্ঘশ্বাস আছে। কবির কোনো একজন মানসীর কথা এসেছে। ওই মানসীই এখানে কবিতা। মানসী শিল্প কবিতা শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। কবির ব্যক্তিগত কথা হয়েছে নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তিগত প্রেম পরিণত হয়েছে বস্তুনিষ্ঠ প্রেমে। কবি জীবনানন্দের প্রেমচেতনা দ্বৈতচেতনা। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের প্রেমচেতনা বহুত্ববাদী চেতনা। কবিতার মধ্যে কথক হিসেবে কবি থাকলেও তাঁর কল্পিত প্রেমিকার থেকে তিনি আছেন বহুদূরে। দূর থেকে দেখেছেন তাঁর পূর্ব পরিচিতাকে নতুন করে, নতুন ভাবে। মিলিয়ে দিয়েছেন কবিতার সঙ্গে মানসী কবিতাকে। ছড়িয়ে দিয়েছেন বহুজনের কাছে।

একই প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে 'ফেরা' কবিতাতেও :

কত আগে, কত অনেক আগে
এক যে ছিল প্রতিধ্বনির মতন
নিচু মুখে মৃদু গলার স্বরে
স্বপ্নে তোমার কথাবলার ধরণ।
নিশ্বাসের একটু ভাপ লাগে,
এমন নয় হৃদয় আঁচে পোড়ে।

আসা যাওয়ার দুদিক খোলা থাকে।
আবাহন না, বিসর্জনও নেই,
প্রতিমা মুখ দ্যাখে তো দর্পণে;
ভেতরে এসো, স্বপ্নে এসো, এই —
কী এক হাওয়া ঠেলছে যে দরজাকে।
দুচোখে চোখ, পাথর হয়ে শোনে।

এসো : শোনে আলাপ-থামা রাত।
স্মৃতিতে, শেষে আশায়, অশ্রুতে
শ্যাওলানুড়ি পায় ধরো তোমাকে।
ঝকঝকে চোখ, নরম গাল ভরাট।
ঝরণাজলে জ্যোৎস্না হেসে ওঠে।
কত আগে, কত অনেক আগে।[৭]

('ফেরা' , 'নতুন কবিতা')

এই কবিতার মধ্যে আছে স্বপ্ন দেখার প্রসঙ্গ। যেন 'নিচু মুখে মৃদু গলার স্বরে' স্বপ্নে কথা বলছে। স্বপ্নটা প্রতিধ্বনির মতো। প্রতিধ্বনি যেমন ফিরে আসে সেরকম ঘটনাটা ফিরে আসছে। নিঃশ্বাস শরীরের ভেতর থেকে বাইরে এসে একটা ভাপ তৈরী করেছে। তবে হৃদয়ে আগুন জ্বলেনি। ঘটনাটার সঙ্গে হৃদয় পোড়ানোর প্রসঙ্গটা আসছে না কিন্তু সেই ভাপটা আসছে। আসা আর যাওয়া — আসা যাওয়া একদিন ছিল কিন্তু আজ আর নেই। এই আসা যাওয়ার আহ্বানও ছিল না — বিসর্জনও ছিল না। প্রতিমা দ্যাখে দর্পণে মুখ। প্রতিমা তো স্থির। এই দর্পণ অতীত জীবনকে ফিরিয়ে আনে এবং সে যেন বলছে :

'ভেতরে এসো, স্বপ্নে এসো,..
এই একটা ডাক।

দরজাকে হাওয়া ঠেলছে। যেন হাওয়ায় দরজাটা খুলে যাচ্ছে অথবা হাওয়ায় দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেউ কারোর চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না, পাথর হয়ে গেছে, স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে।

স্মৃতিতে আছে আশা আর অশ্রু। নুড়িতে যেমন শ্যাওলা জমে তেমনি 'তোমার' পায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। যেন 'তুমি' হাঁটতে পারছ না। শ্যাওলা নীচে, উপরের জল পরিষ্কার। 'ঝক্‌ঝকে চোখ', 'নরম ভরাট গাল', জ্যোৎস্না এগুলো কল্পচিত্র, কল্পনার ছবি। কল্পনা এখানে ছবি হয়ে গেছে :

'কত আগে, কত অনেক আগে'।

এ কবিতায় স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্নে কিছু নেই, কেবল একটা স্মৃতি আর তার সঙ্গে প্রকৃতি মিলেছে — ঝরণার জল, দেবীমূর্তি, জ্যোৎস্না ইত্যাদি। ব্যক্তিগত প্রেম ধীরে ধীরে প্রকৃতির দিকে

যাচ্ছে। সামান্য স্বপ্নদৃশ্য, যে দৃশ্য এখানে নেই কেবল 'এসো', 'শোনো', এরকম দু'একটি সংলাপ আছে। স্বপ্নটার বিমূর্ত ছবি ফুটে উঠেছে। মূর্ত প্রকৃতি, স্বপ্ন বিমূর্ত যেন রূপকথার গল্প লিখছে।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্য যখন প্রেমের কবিতা লিখছেন তখন অনেকেই প্রেমের কবিতা লিখছেন। তন্মধ্যে জয় গোস্বামী প্রধানতম। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের প্রেমের কবিতা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ অথবা লোকায়ত জীবন ও ভালোবাসার ঐতিহ্য পরম্পরায় লগ্ন। জয় গোস্বামীর কবিতায় কোটর সর্বস্ব মানুষী শরীর হাড় হিম করে দেয়। এ শরীর ছত্রাকে ভরা। এ শরীর ছাই ফোটা যা পুরুষত্বকে বিস্মৃত করে :

"সারা গায়ে আজ ছত্রাক আমাদের
চোখ নেই, শুধু কোটর জ্বলছে ক্ষোভে
আমি ভুলে গেছি পুরুষ ছিলাম কিনা
তোর মনে নেই ঋতু থেমে গেছে কবে
পুবদিকে সাদা করোটি রঙের আলো
পিছনে নামছে সন্ধ্যার মতো ঘোর
পৃথিবীর শেষ শ্মশানের মাঝখানে
বসে আছি শুধু দুই মৃতদেহ-চোর।"[৮]

('সৎকার গাথা' , 'উন্মাদের পাঠক্রম')

সঙ্গীটি নারী ও ঋতুকে হারিয়ে উপস্থিত হয়েছে ম্যানোপোজে। ঋতু থামার অর্থ সময় হারিয়ে ফেলা। সাদা করোটি রঙের আলো পুবদিকে। পিছনে সন্ধ্যা নামছে না, নামছে সন্ধ্যার মতো ঘোর।

এই ধারণাকে ছাড়িয়ে কবি বীতশোক ভট্টাচার্য জীবন এবং শিল্পকে সমানতালে এগিয়ে নিয়ে গেছেন 'নীল একপাতা' গ্রন্থের 'দ্বিরাগমন' কবিতায়।

''আর কিছু নেই, শুধু এই একা একা
তোমার ভাবনা নিয়ে জেগে বসে থাকা
আর কিছু নেই, ঘুমিয়ে পড়লে পরে
তোমার স্বপ্নে ভরা বুক উঠে পড়ে,

তন্দ্রাজাগর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তালে তাল দেওয়া মিল নিয়ে চলে আসে
এই আমাদের প্রথম সপ্তপদী।।

"আর কিছু নেই, এ দুই পূর্ণ যদি
কথার ভেলায় কোথায় যে চলে যায়।
আর কিছু নেই, বাচাল স্তবক দুটি
নীরব পাতায় লেখে আর লেখে ছুটি।
ফুল ধরে আছি আজও এই আঁজলায় —
অকূলে চলি গো অন্ধ প্রদীপ যদি...
আমাদের সেই দ্বিতীয় সপ্তপদী।[৯]

('দ্বিরাগমন' , 'নীল একপাতা')

'দ্বিরাগমন' কবিতাটি বিবাহ সংক্রান্ত। এ কবিতায় সপ্তপদী শব্দটি দুবার এসেছে। সাতটি পদের সমাহারকে বলা হয় সপ্তপদী। বিবাহের পর কন্যার দ্বিতীয়বার পতিগৃহে গমনরূপ সংস্কার হল সপ্তপদী। তাহলে এ কবিতা দুটি স্তবকে চৌদ্দপংক্তিকে জড়িয়ে রেখেছে। আর বিবাহের আচারে মেয়েটিও পুরুষের সঙ্গে সাত পা গমন করছে।

'... শুধু এই একা একা
তোমার ভাবনা নিয়ে জেগে বসে থাকা।'

স্মৃতিচারণা করছেন কবি। মধুর ভাবনা নিয়ে বসে আছেন একাকী, জাগরণের মধ্যে। 'আর কিছু নেই' — প্রথম স্তবকে এ পংক্তির দু'বার ব্যবহারে বোঝাতে চেয়েছেন আনন্দঘন মুহূর্তে প্রেয়সীকে নিয়ে নিরাবরণ স্মৃতিচারণা ছাড়া মনমধ্যে অন্য কোন ভাবনা অনুপস্থিত।

'...ঘুমিয়ে পড়লে পরে
তোমার স্বপ্নে ভরাবুক উঠে পড়ে।'

ঘুমের মধ্যেও আসে 'তোমার' স্বপ্ন, প্রেমে ডোবার স্বপ্ন, আনন্দের স্বপ্ন। যার স্পর্শে ওঠা-পড়ার খেলা চলে 'ভরবুকের'।

'তন্দ্রাজাগর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে

তালে তাল দেওয়া মিল নিয়ে চলে আসে'

'ঘুম', 'জাগরণ', 'নিঃশ্বাস', 'প্রশ্বাস' — প্রতিটি মুহূর্তে কবি অনুভব করেন প্রেমের উষ্ণতা, তালে তাল দিয়ে মনের সঙ্গে মনের মিল নিয়ে আগমন ঘটে 'আমাদের' 'প্রথম সপ্তপদী'র। এ গমন বিবাহের অথবা প্রেমের। 'সপ্তপদী' আমাদের আচার, বিবাহ অনুষ্ঠান, সাতমন্ত্রে সাতমণ্ডলিকায় সাত পা আগিয়ে যাওয়া বরের সঙ্গে বধূর। সাতছত্রের প্রথম স্তবকে স্মৃতিকাতরতার চিত্র অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে; 'বাচাল স্বভাব', স্বপ্ন, স্মৃতি, ঘুম, জাগরণ প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তিপ্রেমের গভীরতম প্রসঙ্গ।

কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের শুরুতে আছে :

'... এই দুই পূর্ণ যদি
কথার ভেলায় কোথায় যে চলে যায়

তাহলে এ দুটো জিনিস দিয়ে একটি কবিতাকে পূর্ণ করার চেষ্টা চলছে। কথার ভেলায় ভাসতে ভাসতে দুই পূর্ণ যতি পাড়ি দেয় অজানার উদ্দেশে। প্রেমিক-প্রেমিকার কথা শেষ হয় না। বাচালতা তাদেরকে গ্রাস করে। এ কবিতাতেও 'বাচাল'[১০] শব্দটি এসেছে, আর কবিকে আংশিক বাচালতায় ভর করেছে। না থাকলে তাঁর কবিতা রচনাও অসম্ভব হয়ে পড়ত। হঠাৎ দুটি বাচাল স্তবক আজ স্তব্ধ, নীরব পাতার ওপরে ছুটি লেখে দেয়। বাচাল স্বভাব, স্বপ্ন, স্মৃতি, ঘুম, জাগরণ, প্রেম সব ছুটি নেয় এই স্তবকে। তবুও–

'ফুল ধরে আছি আজও এই আঁজলায়'।

দুঃখ থাকলেও আঁজলায় ফুল ধরে আছেন ব্যর্থ প্রেমিক। তাদের অবস্থা অন্ধ প্রদীপের মতো। অন্ধপ্রদীপ অর্থাৎ প্রদীপের আলো নিভে গেছে। প্রদীপের আলো নিভে যাওয়ার পরেও তার যাত্রা থাকে তবে তা কূলহীন। প্রেম ছুটি নেবার পরেও বর-বধূ / প্রেমিক-প্রেমিকার যাত্রা হয়ে পড়েছে কূলহীন। দ্বিতীয় সপ্তপদী প্রথম সপ্তপদীর প্রতিধ্বনি মাত্র।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের প্রেম দূর থেকে দেখা, কবিতার মধ্যে কবি উপস্থিত থেকেও নেই। 'তোমার', আমাদের সর্বনামের মধ্য দিয়ে তিনি 'দ্বিরাগমন' এর অসাধারণ বিশ্লেষণ করেছেন। মেয়ে যায় নিজের কুল থেকে আর এক কুলে। এ কবিতাও দু'কূলের দিকে যাত্রা – সপ্তপদী বিবাহ এবং সপ্তপদী সাতটি পদের সমাহার এবং অন্ত্যমিল, কিন্তু অন্ত্যমিলের মধ্যে নিকট মিল যেমন থাকে তেমনি থাকে দূরান্বিত মিল — শিল্প এবং জীবন এ কবিতায় সমান্তরাল।

রোমান্টিক কবিতার ঐতিহ্য থেকে সরে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস বহন করে চলেছে 'অধিকার' কবিতাটিও :

'এক ব্রাহ্মণ পেয়েছেন দায়ভাগ
কুসুমফুলের ছোপানো উত্তরীয়;
ছিঁড়ে ফেঁড়ে গেছে গাঢ় রঙা অনুরাগ,
অথচ জড়িয়ে চলা তাঁর খুব প্রিয়।

তাঁকে আরও কথা দিয়েছে মিতাক্ষরা;
বেল ফুল বেঁধে দেবে ও উত্তরীতে।
তাঁকে দেখা গেছে বেদনার ঘ্রাণ নিতে;
ঝরা ফুল তাঁর খুঁটে আছে সব ধরা।"[১১]

('অধিকার', 'দ্বিরাগমন')

মধ্যযুগের জীমূতবাহনের লেখা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সম্পত্তির অধিকার বিষয়ক গ্রন্থ 'দায়ভাগ'[১২]। এখানেও ব্রাহ্মণ পিতৃসূত্রে পুজোর দায়ভাগ পেয়েছেন, যিনি উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারী শব্দের অনুষঙ্গে আসছে উত্তরীয়, যা ব্রাহ্মণের গলায় থাকে। তার রং গাঢ়। কুসুমফুলের রং দিয়ে ছোপানো হয়েছে উত্তরীয়কে। উত্তরীয় আর নতুন নেই। পুরানো হয়ে ছিঁড়ে ফেঁড়ে গেছে অথবা পৌরোহিত্য করে সংসার চলে না, তাই অনুরাগও নেই দেবতার প্রতি, তবুও উত্তরীয়টি গলায় জড়িয়ে রাখতেই হয়। দায়ভাগ অর্থাৎ উত্তরাধিকারী নির্বাচন, সেখানে উত্তরাধিকারী সমস্ত কিছু পারে কিন্তু উত্তরাধিকারীর মধ্যে অনুরাগ কতখানি সেটাও জিজ্ঞাস্য থেকে যায়। এখানে ব্রাহ্মণের আর্থিক কষ্টের চিত্র ফুটে উঠেছে। তবে ভালোবাসা হারিয়ে যায় নি।

দ্বিতীয় স্তবকে 'মিতাক্ষরা'র[১৩] উপস্থিতি ঘটেছে। অর্থাৎ মিত অক্ষর। 'মিতাক্ষরা' হতে পারেন কোনো নারী যিনি বেলফুল বেঁধে দেবেন তার উত্তরীয়তে। হয়তো তিনি ব্রাহ্মণের বেদনার ঘ্রাণ নিতে পেরেছেন। ব্রাহ্মণকে কথা দিয়েছেন যে উত্তরীয় ছেঁড়া হলেও তাতে বেঁধে দেবেন বেল ফুল। তাই ঝরাফুল উত্তরীয়র খুঁটে অথবা নিজের আঁচলের খুঁটে ধরা আছে।

একসময়ের গাঢ় অনুরাগ, কুসুমফুলের রং এর মতো রঙীন অনুরাগ দরিদ্র ব্রাহ্মণের হৃদয়ে

স্থান করে নিলেও কোনো একসময়ে আপনা হতেই পুরানো উত্তরীয়ের মতোই শতছিদ্রে তা পরিপূর্ণ। গভীর অনুরাগ ছিঁড়ে ফেঁড়ে গেছে, তবুও আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন ভালোবাসার জনকে। পথ চলতে চেয়েছেন প্রিয়জনকে জড়িয়ে ধরে। প্রিয়ার দেওয়া প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কুসুম ফুল, বেলফুল শব্দগুলোর ভেতর থেকে গেছে কোমলতার অনুভব।

কবিতাটিতে ব্রাহ্মণের ব্যক্তিগত প্রেম শিল্পের সঙ্গে একটা সাযুজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছে। দুটি স্তবক দুদিকের কথা বলে। একদিকে আছে দায়ভাগ অন্যদিকে বেদনার ঘ্রাণ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশের জন্য কবি চলে গেছেন বাংলার পুরোনো কবিতার কাছে। বাংলা কবিতার যে হাজার বছরের ঐতিহ্য আছে তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। রামায়ণ, মহাভারত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার বিষয়, বৈষ্ণব গান, ঢপ গান কবির প্রকাশের উপায় :

"ঘুমিয়েছে তিলোত্তমা : সরসীর মাঝখানে শশীর মতন;
জলজ আয়না তার মধ্যখানে। ঘুম যায় প্রমীলা চিতায়।
মন্দোদরী ঘুমিয়েছে; ঘুমিয়েছে চিত্রাঙ্গদা। সীতা ঘুম যায় —
শিথানে রামের বাহু সরে গেছে। স্বপ্নে ভরে এ অশোকবন।
চেড়ীরা দুঃস্বপ্ন দেখে। বৃন্দাবন থেকে মথুরায়
স্বপ্নচারী চলে রাধা। ভারি হাত – খসেছে লিখন;
ঘুমিয়েছে বীরাঙ্গনা। রাজকন্যা এ মঞ্চে ঘুমায়;
শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারীর ঘুম। এ মায়াকানন।

এই মায়ামন্ত্রধ্বনি, সদ্য ঘুম-ভাঙা এই বাংলা উচ্চারণ
ভেঙে পড়ে, ভেঙে পড়ে কেবলই অসংবৃত সংহত কান্নায়।
জননী জাহ্নবী কাঁদে; কাঁদে কপোতাক্ষ; আর সমুদ্র যা পায়
তাও শুধু লোনা জল। সাশ্রু মাথুরের পদ, কে করো কীর্তন ?
কে গো তুমি : মধু-কান ? ভরাট গলার কে, এই ভোরাই গায় ?
জানে না। ঘুমায় মহীর কোলে, নিদ্রাবৃত শ্রীমধুসূদন।"[১৪]

('মধুসূদনের জন্য' , 'প্রদোষের নীলছায়া')

'মেটোনিমি'[১৫] (Metonymy) নামে একটি বিদেশী অলংকার আছে। শ্যামাপদ চক্রবর্তী

এর পরিভাষা করেছেন 'অনুকল্প'। বলাবাহুল্য 'মেটোনিমি'র সঙ্গে অনুকল্পের একটা দূরত্ব আছে। দূরত্বটা এই : একটি প্রসঙ্গকে বোঝাতে গিয়ে আরো ভিন্ন প্রসঙ্গ বা শব্দ বিকল্প হিসেবে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ অনুরূপ কল্পনা। 'মধুসূদনের জন্যে' কবিতায় একটার পর একটা চরিত্র এসেছে এবং এ চরিত্রগুলির সবাই প্রেমিকা। তাদের প্রেম, ভালোবাসা, সংসার সবই সহচর ছায়ার মতো এ কবিতায় উঠে এসেছে এবং এই প্রেমিক চরিত্রগুলিকে বোঝাতে গিয়ে কবি বীতশোক অশোকবন বা মায়াকাননে আবদ্ধ নেই বৈষ্ণবপদাবলী এবং ঢপকীর্তনের গায়ক মধুকানকেও[১৬] তুলে এনেছেন। তাঁর মা জাহ্নবী, কপোতাক্ষ নদ, সবই এখানে উপস্থিত এবং অদ্ভুত এক মায়ার পরিবেশ তৈরী হয়েছে। সব হারানোর দুঃখ নিয়ে ঘুমিয়ে আছে চরিত্রেরা, না জেগে উঠে চলাচল করছে, এইরকম এক বৈপরীত্য ও অনুষঙ্গাতুর।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য রচনা করেন মধুসূদন দত্ত। তিল তিল করে গড়ে ওঠা সুন্দরী প্রতিমা যাকে কেন্দ্র করে চলে দুই পুরুষের (সুন্দ ও উপসুন্দ) লড়াই, কবি সেই তিলোত্তমাকে[১৭] তুলনা করেছেন চাঁদের সঙ্গে। সমুদ্রের মাঝখানে চাঁদের মতো তিলোত্তমার ঘুম। একইভাবে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছে প্রমীলা, মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা। সীতাও ঘুমিয়েছে রামের বাহুর ওপর মাথা রেখে। তবে পরক্ষণেই সীতার মাথা থেকে সরে গেছে রামের বাহু। অশোকবন স্বপ্নেভরা। খারাপ স্বপ্ন দেখে চেড়ীরা। রাধার যাত্রা বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরার দিকে। আবার নিশ্চিন্তে ঘুম নেয় বীরাঙ্গনা, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী নাম্নী রাজকন্যার দল। এ সবকে কবি তুলনা করেছেন মায়াকাননের সঙ্গে।

এখানে অনেক প্রসঙ্গ আছে। আছে রামায়ণের সীতার কথা, প্রমীলা, মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদার প্রসঙ্গ, বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার প্রসঙ্গ, আছে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। এবং প্রত্যেকটি প্রসঙ্গই প্রেমের। এ প্রেম শেষপর্যন্ত বিচ্ছেদের আকার নিয়েছে। রাবণের প্রিয় পত্নী মন্দোদরী, প্রিয়া চিত্রাঙ্গদা স্বামীর প্রতি গভীর অনুরাগিনী হয়েও সরে আসেন ঐ পর্যায় থেকে। প্রেম শিথিল হয়ে পড়ে রাম-সীতার ক্ষেত্রেও। রামের বাহু সরে যায় ঘুমন্ত সীতার মাথা থেকে। স্বপনচারিণী রাধা মথুরাতে যায় কৃষ্ণের খোঁজে। কবিতায় 'অশোকবন'এর প্রসঙ্গ এনেছেন কবি। 'অশোকবন' রামায়ণের 'সুন্দরাকান্ড'-এ এই বনের উল্লেখ আছে, যেখানে সীতা আপনমনে স্মৃতিচারণা করত। 'অশোকবন' শব্দটির মধ্যে অন্য তাৎপর্য পাই। 'অশোক'- নেই শোক যার। বন – জঙ্গলে নানা ধরনের গাছ থাকে। অশোক গাছ বেশী থাকলেও অন্যান্য গাছের সংখ্যাও

অশোকবনে কম নয়। মানুষের স্বভাবের মতো বনের প্রবৃত্তি। মানুষ যেমন দোষ গুণে ভরা, অশোকবনও অশোকের সঙ্গে বিভিন্ন গাছে ভরা, মমতার বন্ধন সেখানে, মনের ক্লান্তিও দূর করে তরুছায়া। বীরাঙ্গনারা প্রিয়তমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। হেরে গিয়ে জীবননাট্যের মঞ্চে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে রাজকন্যারা।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে তারা দেখে সব ফাঁকা। ভেঙে পড়ে কান্নায়। এ কান্না অসংবৃত, আবরণহীন। অনেক ঊর্ধ্বে ওঠে এ কান্না, একে ধরে রাখতে বা আয়ত্ব করতে পারা যায় না। আবার সংহতও এ কান্না। গুন্‌গুন্‌ করে নীচে নেমে আসে। যেভাবেই হোক কবিতার মধ্যে কবি কান্নাকে রেখেছেন। কাঁদেন জননী জাহ্নবী, কাঁদে কপোতাক্ষ নদ, মধুসূদনের জন্য। চোখের লবনাক্ত জল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় সমুদ্রের লোনা জলের সঙ্গে। বিরহ-যন্ত্রণা বুকে নিয়ে কাঁদে রাধা কৃষ্ণের জন্য। প্রথম স্তবকে দেখতে পাই উল্লাসের বৃন্দাবন ত্যাগ করে রাধা যাত্রা শুরু করেছেন মথুরায়।

ব্যক্তিপ্রেম মৃত্যু আর কান্নার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে নৈর্ব্যক্তিকতায়। ঘুম আর শূন্যতার বোধ কবির কাব্যপংক্তি ঢেকে দেয়। ভালোবাসার এবং নিঃসঙ্গতার কালো হাঁ কবির চেতনা গ্রাস করে। শব্দের অমোঘ ব্যবহার, সরসী, শশী প্রভৃতি চিত্রকল্পের যথার্থ প্রয়োগ কবির কবিতার বিষয়কে করে তুলেছে মূল্যবান।

এ কবিতার প্রথম স্তবকের চারটি পংক্তি রামায়ণের কথা মনে করিয়ে দেয়। পরের পংক্তি স্মরণ করায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসঙ্গ। রাধার মনের প্রেমের অনুভূতি থেকেই এই চলা। কবিতাটি রামায়ণ, বৈষ্ণব কবিতার ধারা বেয়ে এলেও রামায়ণও নয়, আবার বৈষ্ণব কবিতাও নয়। নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব থেকে রচিত এ কবিতায় ঘটেছে বিনির্মাণ[১৮]। প্রেম বিষয়ক কবিতা হলেও সে অর্থে প্রেমের কবিতা নয়। এখানে তিলোত্তমার কাহিনী, রাবণ-চিত্রাঙ্গদা-মন্দোদরীর প্রণয়, রাম-সীতার গভীর টান, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মধ্য দিয়ে কবির বাঙালীর প্রেমচেতনাকে আরো প্রকট করে বিশ্লেষণ করে দেখানোর প্রয়াস দেখতে পাই এ কবিতায়।

কবির ব্যক্তিগত ভালোবাসা এখানে ভালোবাসা প্রসঙ্গটিকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে বাংলাসাহিত্যের নানা চরিত্রকে এবং ব্যক্তিগত জীবনকেও টেনে এনেছেন। অর্থাৎ কবি–মানুষের ভালোবাসা বহুত্বের মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে।

'রাখালিয়া' কবিতাতেও তিনি বৈষ্ণব কবিতার প্রসঙ্গে এনেছেন। মূর্ত প্রেমকে উজিয়ে

দিয়েছেন বিমূর্ততার দিকে :

"আমার না এই বলার কিছুই নেই,
দ্যাখ্ আমায় তবু কথা বলাবেই ও।
কাঁদবো না হেসে কাঁদবো না বলতেই
হাসাবে কাঁদাবে, ভারি শিংভাঙা গোঁ।
জংলি গোঁয়ার, জানিস একটা ভূত
অদ্ভুত, ভাবি কতোবার ভাববো না :
কিনারায় বন ঘনচ্ছায়া বিদ্যুৎ,
মেঘ ঝেঁপে এসে থমথমে এই গাঁ।
শেষটায় ওর ঘুমিয়ে পড়ার জুত,
তাই বলে আমি ঘুমোবো, ওমারে মা।

আকাশ ঘিরেছে আড়ালের ওই টিলা,
নিকষ পাথর, আঁচলে রাখবো ঢেকে,
কে বাজায় বাঁশি, সারা গায়ে অবলীলা,
শরীর আমার বেরিয়েছে মন থেকে,
যম আর যমুনা পাশাপাশি রাত ভোর,
চাঁচর চুল ওর, দেখি চুল খুলে রেখে;
আমার চোখের মণির চেয়েও ঘোর
কালো রং ওর; সই গো এখন যা।
পোড়া চোখে ওই শ্যামলিমা নামে ওর।
তাই বলে আমি ঘুমোবো, ওমারে মা।'[১৯]

('রাখালিয়া' , 'এসেছি জলের কাছে')

কবির কবিতার 'কে বাজায় বাঁশি' পংক্তিতে বড়ু চণ্ডীদাসের 'কেনা বাঁশী বা এ'[২০] পংক্তির বিনির্মাণ ঘটেছে। 'শরীর আমার বেরিয়েছে মন থেকে' পংক্তিতে চণ্ডীদাসের 'দেহ ছাড়ি মোর প্রাণ যেন চলি যায়'[২১] পদের উল্লেখ আছে। শরীরে জীবাত্মা[২২] রাধা আর মন পরমাত্মা কৃষ্ণ।

রাধার হৃদয়ে প্রেমের অনুভূতি ঘটে। সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে শরীর। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে আছে পরমাত্মা কৃষ্ণ থেকেই উদ্ভব ঘটেছে জীবাত্মা রাধার।

'যম আর যমুনা পাশাপাশি রাত ভোর।' —

যম [২৩]-মৃত্যু, যমুনা[২৪]-প্রেম। ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রথম প্রেমিক-প্রেমিকা হলেন যম আর যমুনা।, সম্পর্কে ভাই-বোন। দু'জনের প্রেম অবৈধ। আবার রাধাকৃষ্ণের প্রেমও অবৈধ। রাধার চোখের মণি কৃষ্ণ। তার চোখের মণির থেকে ঘোর কালো রং কৃষ্ণের। প্রিয়জন রাধার পোড়া চোখে ফিরে এসেছে 'শ্যামলিমা' হয়ে।

এ কবিতাটিও বৈষ্ণব কবিতার ধারা অনুসরণ করেছে, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা নয়। সে অর্থে প্রেমের কবিতাও নয়। এখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মধ্য দিয়ে বাঙালীর প্রেমচেতনা কেমন ছিল তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন কবি। তিনি কবিতায় বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন।

কবির কবিতায় মানুষী গদ্য হয়ে উঠেছে শিল্পের ছন্দ। জীবনকে শিল্পে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি জীবন থেকে দেখার দূরত্বে সরে দাঁড়িয়েছেন। ঐতিহ্যের সঙ্গে লোকায়তকে মিলিয়েছেন 'কোজাগরী' কবিতায়।

'তোমার কি মনে আছে গত বছরের লক্ষ্মী পুজোর দিনটিতে
আমরা দিইনি পুজো, এক মন্দিরের থেকে আর এক মন্দিরে
খুঁজে খুঁজে চলে গেছি; দূর থেকে কাছে এসে আরোই নিভৃতে
চলে যেতে গিয়ে খালি গর্ভগৃহে দাঁড়িয়েছি, তাকিয়েছি ফিরে
এ-ওর চোখের দিকে... দেবীর মুখের দিকে আয়না ধরে দিতে
পুরোহিত ভুলে গেছে : আসলে পুজারি নেই; প্রতিমাও ধীরে
অন্তর্হিত হয়ে গেছে; আমাদেরও পুজো নেই। মন্দিরের ইটে
উৎকীর্ণ জীবনশিল্প অমরতা হয়ে আছে আমাদের ঘিরে।

এ পোড়ামাটির কাজ কাদের যে; কারা এই মন্দির বানাল :
বলার আগেই চোখ বাইরে গিয়েছে সরে — লাল মাটি ঢেউ
দিকের শেষের দিকে নীল আকাশে ভেঙে গেছে। দেওদীণ কেউ
মন্দির গড়েছে নাকি; তারও সুতনুকা ছিল; সেদিনের আলো

আজ মুছে গেছে কিনা — এ কোজাগরীতে সব ভুলে যাওয়া ভালো।
তবু কেন মনে হয় তোমার কি মনে আছে সেই দিন, সেই তোমাকেও।'[২৫]

('কোজাগরী', 'নীল এক পাতা')

'কোজাগরী' অর্থাৎ কে জাগছে। লক্ষ্মীপুজোর রাত্রি, সেখানে মানুষকে জেগে কাটাতে হয়। কবি যে কোনো একজনকে বলেছেন :

'... গত বছরের লক্ষ্মীপুজোর দিনটিতে
আমরা দিইনি পুজো, এক মন্দিরের থেকে আর এক মন্দিরে,
খুঁজে খুঁজে চলে গেছি...'

কিন্তু মূর্তি না দেখে খালি গর্ভগৃহে ঢুকে পড়েছেন এবং নিভৃতে দাঁড়িয়েছেন দুজনে :

'... তাকিয়েছি, ফিরে
এ ওর চোখের দিকে...'

মানব-মানবী দুজন দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে শিল্পের ভাষা ফিরে পায়, ফিরে পায় দেবীর মহিমা। দেখা যাচ্ছে দেবীর মুখের সামনে পুরোহিত আয়না দিতে ভুলে গেছে। আবার কবি বলছেন আসলে পুরোহিত নেই, প্রতিমাও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে গেছে এবং আমাদেরও পুজো নেই। কিন্তু মন্দিরের পোড়া মাটির গায়ে জীবনের শিল্প থেকে গেছে এবং সে শিল্পে প্রাচীন বঙ্গলিপির মতো উঠে এসেছে 'দেওদিন-সুতনুকা'। আর নিম্নবর্গীয় সেইসব মানুষ যারা মন্দির বানিয়েছে। কবির 'বন্দনা' কবিতাতেও সুতনুকা-দেবদত্তের[২৬] প্রসঙ্গ আছে।

'বন্দনা'[২৭] কবিতাতে যে পূজা বা বন্দনা ছিল–

'বন্দনা, করে নিজেদেরই সুতনুকা দেবদত্ত।'

'কোজাগরী' কবিতায় তা অনুপস্থিত। প্রতিমাও এখানে অন্তর্হিত হয়েছেন। সুতনুকা দেওদিনের জীবন শিল্প যেন একই অস্তিত্বে কবি ও কবিপ্রেমিকার মিলিত আবির্ভাবে দেবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করে। একই সভায় নরনারীর মিলিত রূপের প্রসঙ্গ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কবিতার অর্ধনারীশ্বর ভাবনাকে, স্মরণ করিয়ে দেয় রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবকে। এ কবিতায় ফুটে উঠেছে নিম্নবর্গীয় সেইসব মানুষ যারা পোড়ামাটির কাজ রেখে গেছে মন্দিরের গায়ে। এ প্রেম ছড়িয়ে গেছে বহুত্বের দিকে।

কবির শিল্প ভাবনায় উপস্থিত সহজ অভিভূত প্রেম। ভালোবাসার অন্যরকম লাবণ্য তুলে ধরেছেন 'রাত্রে' কবিতায়। এখানে যৌন অনুষঙ্গ, কামতপ্ত মিলনের অনুরণন আছে। এসব ছাপিয়ে বেদনার ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

"এ কোন শূণ্য জেগে ওঠে বহুব্যাপ্ত;
বাহুমূল থেকে জানুসন্ধিতে রাত্রে;
পথ করে দাও একাকী প্রেমিক; রাত্রে
নদী বহে যায় নিরবধি নিঃশব্দ।

নদী বহে যায়, সে সহনক্ষম বেদনা;
ফেনার চূড়োয় সন্তান — তার স্বর্ণ
ডানায় কাঁপছে, সে পক্ষপুট, বেদনা
মুড়ে দাও যেন আবৃতপর্ণ, রাত্রে।"[২৮]

('রাত্রে' , 'অন্যযুগের সখা')

এ কবিতায় দেহমিলন ও তার পরবর্তী রাগমোচন চিত্রিত হয়েছে অপূর্ব কাব্যভাষায়। রাত্রি এখানে পটভূমি। আর রাত্রি এখানে উদ্দীপন বিভাব। এক নৈঃসঙ্গের দূরত্ব মিলনের কোজাগরে বহুব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে, মিলনের শুরুও তেমনি বাহুমূল থেকে; বাহুমূল থেকে জানুমূল। পূর্বরাগ থেকে সঙ্গমের পূর্বমুহূর্ত অপার রাত্রির ভাষায়। শব্দ প্রয়োগে গ্রীক ভাস্কর্যের বাঙ্ময়তা পেয়েছে। প্রেমিকের এখানে নদী পেরুনোর প্রসঙ্গের ভেতর দিয়ে নারীসঙ্গ প্রকট হয়েছে। এবং যা কেবল নারী-পুরুষের দ্বৈত সম্পর্কের যে একক এবং মিলনের পরবর্তী নৈঃশব্দ্য। তার প্রসঙ্গেই শেষ হয়েছে প্রথম চতুষ্ক।

পরবর্তী চারটি চরণে, নদী বহে যায় — বয়ে চলা জীবনের প্রসঙ্গ এবং বহুব্যাপ্ত; শুরুর চরণান্তের 'বহুব্যাপ্ত' শব্দটি লক্ষ্যনীয়। শেষ পর্যন্ত নারীপুরুষের মিলনের চরম ফসল যে সন্তান তার জন্ম সম্ভাবনাও উচ্চারিত হয়েছে। 'স্বর্ণডানায় কাঁপছে' — সেই উজ্জ্বল আগামীর পরিচায়ক। তবুও শেষ পর্যন্ত আপাত বিচ্ছেদের 'বেদনা' একত্রে মিশে রয়েছে। আর রাত্রি সেই মিলনের নিঃশব্দ ইতিহাসকে বহন করেও শেষ পর্যন্ত আসন্ন ক্ষণিক বিচ্ছেদের বেদনায় আবৃত। অন্ধকারের পাতায় মোড়া রাত্রি।

কবিতাটি স্তবকবিন্যস্ত। চার-চার পংক্তির দুটি স্তবক। এখানে যৌন অনুষঙ্গ থাকলেও শেষ পর্যন্ত এ কবিতা যৌনতার নয়, বেদনার। প্রেমের ভাস্বর-শূণ্যতা যৌনলাঞ্ছিত হয়ে নিঃশব্দে বেদনার হাহাকার নিয়ে জেগে উঠতে চাইছে।

ব্যক্তি দাম্পত্যকে শিল্প দাম্পত্যে উন্নীত করেছেন 'দ্বিরাগমন' কবিতায় :

"সে আজ তোমায় দেয় একটি স্তবক।
অন্ধকারে বেঁকে যায় ছায়াপড়া বীথি।
ফুল ঝরে পাতা খসে যায় – এক থোক,
সে তোমার মনে রাখে কত জন্ম তিথি।

আছ তাই লগ্নতার আসে জন্মাবার।
ভরা মুখে চেয়ে থাকো, চাও খুশি চোখ
হোক হাসি শিশু ফুল খাতা কবিতার
তুমি আজ তাকে দাও একটি স্তবক।'[২৯]

('দ্বিরাগমন' , 'দ্বিরাগমন')

এই কবিতায় প্রেম দাম্পত্যের উপকূলবর্তী। 'সে' এখানে দাতা। দাতা পুরুষ জন্মতিথি মনে রেখে দান করেছে স্তবক। 'স্তবক' বলতে পুষ্পের স্তবককেও বোঝায় আবার কবিতার স্তবককেও বোঝায়। কবিতাটি এখানে ফুলের স্তবক হয়ে গেছে। এটি জন্মদিনের কবিতা। কবিতার প্রথম স্তবকে আছে জন্ম, মৃত্যু ও স্মৃতির প্রসঙ্গ। স্তবক থেকে ঝরে পড়েছে ফুল, খসে পড়েছে পাতা। অন্ধকার, 'ফুলঝরা', 'পাতাখসা' — শব্দগুলির মধ্যে আছে মৃত্যুর প্রসঙ্গ। আর 'মনে রাখা' কথাটি টেনে নিয়ে আসে স্মৃতির প্রসঙ্গ। অন্ধকারে দাম্পত্য মিলনের ইতিহাস এখানে বিধৃত আছে।

পুরুষটির দানের সার্থকতা আছে দ্বিতীয় স্তবকে। এখানে জন্মানোর প্রসঙ্গ আছে — মৃত্যু আছে আবার পরে জন্মও আছে। দয়িতা 'তুমি' তার ভরা মুখে চেয়ে থাকা আর চোখের খুশিতে 'সে' পুরুষ একটা নতুন প্রাণের জন্মলগ্ন পড়তে পেরেছে। দেওয়া নেওয়ার এই খেলার ফল শিশু, হাসি আর কবিতা। কবিতাটিতে স্তবক দুদিকে আছে। কবিতার স্তবক আবার ফুলের স্তবক — এখানে আছে উভযোজ্যতা।

কবির ব্যক্তিগত দীর্ঘশ্বাস গোটা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস হয়ে উঠেছে 'অন্তর্জলি' কবিতায় :

"রাধারানী তোকে আমি হারিয়ে ফেলেছি।
রথের রশির টান অর্ধেক না হতে এল বৃষ্টি, ঝড়। চুলে
তোর যে ফুলের মালা শোভা পেত, আমি সব বহুমানে কিনে
নিতে চাইলে বেলা হলো, ততক্ষণে ভাঙা মেলা, চুপড়ির আলতা সিঁদুর
হলুদ মাখানো গাঢ় তেলরঙ ছিঁড়ে পড়ে আছে। ছেলেবেলা পড়া
'কিশলয়' বইটির প্রেমে এই পড়া গেল, প্রৌঢ়তার ভান
ছত্রখান, তবু তাকে এভাবেই বলি।'[৩০]

('অন্তর্জলি' , 'অগ্রন্থিত কবিতা')

এখানে রাধারানী'র কথা বলেছেন কবি, যাকে আমরা পাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রাধারানী'র রথের মেলাতে। রথের রশির টান পড়তে না পড়তেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় যার জীবনকে এলোমেলো করে দিয়েছিল। একদিন যার চুলে শোভা পেত ফুলের মালা, সেই মালা আহরণ করতে গিয়ে কবি দেখেন সময় শেষ, তখন ভেঙে গেছে মেলা। রাধারানী বুঝতে পারল না কবি তাকে হারিয়ে ফেলেছেন।

রাধারানীর প্রতি কবির বাল্যপ্রেম আছড়ে পড়েছে প্রৌঢ়তার ভনিতা নিয়ে। এই ভনিতা ছত্রখান হয়েছে 'কিশলয়' পুস্তকটির পংক্তিতে। 'কিশলয়' বইয়ে আছে রাধারানীর প্রসঙ্গ। ছেলেবেলায় কিশলয় পুস্তকটি পড়ে কবি বাল্যপ্রেমে মগ্ন হন। তারপর বয়ে যায় বেলা। দেখেন রাধারানীর তেলমেদুর গায়ে আলতা, সিঁদুর, হলুদ মাখানোর চিহ্ন। আর একসময় শরীর থেকে ধীরে ধীরে পড়েছে গুঁড়ো গুঁড়ো হলুদ। কবির বাল্যপ্রেম গুঁড়ো হলুদের মতোই আস্তে আস্তে ঝরে পড়ছে। কৈশোর থেকে প্রৌঢ় বয়সে এসে উপলব্ধি করেছেন ছেলেবেলায় পড়া 'কিশলয়' বইয়ের প্রতি বাল্যপ্রেম প্রৌঢ়তার ভনিতা মাত্র।

'শৈশবেই মাতৃহীন এই তরুণ' মায়ের স্মৃতিকে অবলম্বন করে আপ্লুত হয়েছেন মাতৃপ্রেমে। প্রকৃতির আপাত চলমানতাকেও মায়ের প্রতি প্রেমের অলঙ্কারস্বরূপ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর নৈসর্গিক ভাবনার কবিতা পংক্তিগুলিতে। 'মাতৃপ্রেম' এই শব্দের মধ্যে স্নেহ, মমতা, অপত্য আসক্তি যতটা পরিস্ফুট হয়েছে তার থেকে বেশি প্রকট

হয়েছে অতীন্দ্রিয় ও ঐশ্বরিক বিষয় সম্বন্ধীয় উপলব্ধি :

"জলের শব্দে মার কথা মনে হল।
ঝরণার জল, আর কোন্ ছেলেবেলা
জল যেতে যেতে কী পাথরে ঠেক খেল —
উছলে উঠল, আর সেই ছেলেখেলা;
আলতো পাথর ডিঙিয়ে মায়ের পাশে;
মা'র হাঁটুজল; নিচু হয়ে আঁজলাতে
জল ভরে নিল, ঝরে গেল অভ্যাসে।
আঁজলাতে রোদ, অঞ্জলি-করা হাতে
ঝিকিমিকি ভরে রোদ হেসে মরে গেল;
ভেঙে পড়ে গেল এলোমেলো ভারি খোঁপা;।
ঝরণার জলে মার মুখ ভেঙে গেল —
সেই একবার — আর সব বোবা, বোবা।'[৩১]

('মাতৃভাষা' , 'অগ্রন্থিত কবিতা')

কবিতাটিতে মার কথা মনে হওয়ার প্রসঙ্গ আছে। মায়ের কথা সকলের মনে পড়ে, ভিন্ন ভাবনায়, ভিন্ন আঙ্গিকে। ঝরণার জলের শব্দে কবির মার কথা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণে এল তাঁর ছেলেবেলা। প্রথম পংক্তিতে আছে মাকে মনে হওয়ার পুরানো স্মৃতি। আর তৃতীয় পংক্তিতে আছে মাতৃপ্রেমের মূল প্রসঙ্গ। ঝরণার জল যেতে যেতে পাথরে ধাক্কা খেয়ে উছলে ওঠে, মানুষের জীবনও স্বাভাবিকভাবে বইতে বইতে সহসা কোন কিছুতে জোর ধাক্কা খায়। লাফিয়ে ওঠে জলের মতো। তখন মনে পড়ে পুরানো সব কথা। এখানে কবি ধাক্কা খেয়েছেন জলের শব্দে এবং মনে এসেছে মা'র কথা। নদী সমুদ্র বা ঝরণার জলশব্দ তো প্রকৃতির দান। এখানে 'মা' এবং প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জলের শব্দ শুনে কবির পরিণত বয়সে যেমন মার কথা মনে আসে, পাশাপাশি প্রকৃতির কথাও মনে পড়ে। মাতৃপ্রেম আর প্রকৃতিপ্রেম দেখা দেয় অভেদ রূপে। জলের এই নিরবধি বয়ে যাওয়া একটানা গান গাওয়ার মতো। সুর, ছন্দ নিয়ে কবির ভাবনা থেকে যেন গড়ে উঠেছে গান।

'ছেলেবেলা'য় 'ছেলে খেলা'র কথাগুলো অদ্ভুতভাবে কবির মনে আসে। ঝরণার ধারে

যাওয়া, 'আলতো পাথর ডিঙিয়ে' মায়ের কাছে দাঁড়ানো, হাঁটুজল মায়ের, হাতের আঁজলাতে নীচু হয়ে জলভরা, আবার আঁজলা থেকে জল ঝরে যাওয়া। কবি দ্রষ্টা, তিনি কিছু করছেন না, বিস্ময় মাখানো আনন্দের দৃষ্টিতে কেবল মার দিকে তাকিয়ে আছেন। জলের কাছে এসে উচ্ছ্বসিত মাকে দেখে কবির যে আনন্দ তা মাতৃপ্রেমের।

'আঁজলাতে রোদ, অঞ্জলি করা হাতে
ঝিকিমিকি ভরে রোদ হেসে মরে গেল;'

এখানে কবির সুর পরিবর্তন ঘটেছে। 'আঁজলাতে রোদ' অর্থাৎ হাতে যে জল তোলা হয়েছে তার ওপরেও রোদ পড়েছে তারপরই 'ঝিকিমিকি ভরে রোদ হেসে মরে' গেছে। গভীর দুঃখের, যন্ত্রণা-বেদনার কথা আছে। এই চরণ থেকে কবিতা কেমন অন্য গতি নিয়েছে। 'ভেঙে পড়ে' যায় মায়ের 'এলোমেলো ভারি খোঁপা'। 'ঝরণার জলে' ভেঙে যায় মায়ের মুখ। তারপর সব চুপ, বোবা হয়ে যায়। জলের শব্দে কবির মাতৃস্মৃতি ভেসে ওঠে, হঠাৎ করে স্মৃতির সরোবরের জল ভেঙে গিয়ে সমস্ত ছবিকে চুরমার করে দেয়। চুপ হয়ে যায় মায়ের সঙ্গে কবির কথা বলা।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের লেখার ধরণই এরকম। এগিয়ে যাওয়া। আনন্দঘন মুহূর্তগুলো সুন্দরভাবে এগিয়ে গেছে শোক-দুঃখের দিকে। ব্যক্তিপ্রেম এগিয়ে গেছে নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে। এ কবিতার মধ্যে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে আনন্দভরা জীবনের হঠাৎ করে যাওয়ার চিত্র। 'রোদ হেসে মরে গেল', 'ভেঙে পড়ে গেল' এলোমেলো ভারি খোঁপা; 'জলে মা'র মুখ ভেঙে গেল' — প্রতিটি পংক্তিতে আছে শোকের ঘ্রাণ। পুরোনো শোক যা স্মৃতি হাতড়ে পেয়েছেন কবি। 'ভারি' শব্দের মধ্যে আছে 'মন' 'ভার' করার যন্ত্রণা, শোক ভার – কবি হৃদয়কে করে বেদনাগ্রস্ত। তবে এ যন্ত্রণা কবির একার নয়, সর্বসাধারণের। এই মাতৃপ্রেমের প্রসঙ্গ তিনি নিয়ে এসেছেন 'হারমোনিয়াম'[৩২], 'ফেরি'[৩৩] এরকম অনেক কবিতাতেই। তাঁর এই কবিতাগুলোতে কেবলই মায়ের প্রসঙ্গ। আবার পুরাণ, লোককথা, ব্রতকথার সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে মিশিয়ে বাংলার চেহারাকে অভিনবরূপে জাগিয়ে তুলেছেন তাঁর অন্যান্য কবিতায়।

কবির কবিতায় ধীরে ধীরে প্রেম সরে যায় প্রকৃতিতে। প্রকৃতির থেকে হয় গান পূজাপর্যায়ের। প্রকৃতির মূল্যবান সম্পদ হল মানুষ, গাছ, ফুল, ফল, পাখি প্রভৃতি। প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বরের অসীম রহস্য আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে কবি বীতশোক ভট্টাচার্য হয়েছেন

বিশ্বপ্রেমিক :

"ফেরা মানে চৈত্রমাস : সর্বনাশ সেইকার দু-চোখে সংহত —
রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কেউ বেশি জানেন তা। প্রেম থেকে প্রকৃতি পর্যায়ে,
প্রকৃতির থেকে পূজা পর্যায়ে যা গান হয় – যেন ঝড় হতে
কালবৈশাখের মূর্ত রুদ্ররূপ শিবরূপে সরে সরে যায়
রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিকোন..."[৩৪]

('বার্ষিকী' , 'প্রদোষের নীল ছায়া')

এই কবিতায় কবি রাবীন্দ্রিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে চৈত্রমাস সর্বনাশের মাস। চৈত্রমাস বৎসরের শেষ মাস। আবার প্রেমেরও শেষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেম দ্বৈত-ব্যক্তিগত ও ঈশ্বরমুখী। তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত আকুতি চলে গেছে পূজা পর্যায়ে। আবার কবির 'বিশ্ব অনুভূতিতত্ত্বে' জড়িত হয়েছে মানব প্রীতির সঙ্গে প্রকৃতি প্রীতির সঙ্গে ঈশ্বর প্রীতি। প্রকৃতির মহিমাকেও পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনি। কালবৈশাখীর ভয়ঙ্কর রুদ্ররূপ সরে যায় শিবরূপের দিকে।

মানুষের সংস্পর্শে এসে মানুষের প্রেম-ভালোবাসাকে তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে বুঝতে পেরেছেন যাকে ভালোবাসা বলে তাই পূজা। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে প্রেমের কাব্য সাহিত্য পূজাতে রূপান্তরিত হয়েছে। নরনারীর প্রেম আর মানুষের দেবতার প্রতি প্রেম দুই-ই পূজা। প্রেম নির্মল শুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদয়বীণায় স্বর্গীয় প্রেমচিন্তা অনুরণিত হয়েছে মানবের প্রেমকে কেন্দ্র করে। কবি যাকে ভালোবাসা বলেছেন তার মধ্যে আছে অনন্তের পরিচয়, আছে সীমাতীত ঐশ্বর্য। এই রাবীন্দ্রিক ঐশ্বর্যকে কবি বীতশোক ভট্টাচার্য চারিয়ে দিয়েছেন বহুত্বের দিকে। মূর্ত রূদ্ররূপ পরিণত হয়েছে বিমূর্ত শিবরূপে।

উদ্ভিদ জগৎ ও প্রকৃতিকে নিয়ে যে পটভূমি রচিত হয় তার আত্তীকরণে মানব প্রেম রূপান্তরিত হয় শিল্পে তারই পরিচয় পাই নিম্নোক্ত ছত্র দুটিতে :

"স্নিগ্ধ বয়ানের মতো পত্রপুটে আনা প্রাতে অন্ধবালিকা,
নয়ন, পিছল ফল যত রমণীর বক্ষে পুষ্পমালিকাকে'[৩৫]

('অন্ধবালিকা' , 'অন্যযুগের সখা')

অন্ধবালিকা প্রাকৃতিক সম্পদ ফুল নিয়ে তৈরি করে পুষ্পমালিকা। অবশ্য নিজের জন্য

নয়, অপরের জন্য। ড. নিতাই জানার কথায় প্রকৃতি থেকে সম্পদ নিয়ে এই যে সৌন্দর্য নির্মাণ তা এগিয়ে যায় দুটি দিকে — ক) প্রয়োজনের দিকে, খ) অপ্রয়োজনের দিকে। চিরকাল এই দুটো দিক কাজ করে সৌন্দর্য নির্মাণে। কবি রচিত শিল্পও প্রয়োজনের এবং অপ্রয়োজনের। সৌন্দর্য শব্দটির অনুষঙ্গে উঠে আসেন শিল্পিও যিনি ফিরিয়ে আনতে পারেন হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ ও মানবিকতাকে।

পৃথিবীর যন্ত্রণা থেকে জন্মায় ফুল, উদ্ভাসিত হয় মৃদ্‌গত অন্ধকার থেকে। ফুল একদিকে যন্ত্রণার, বেদনার অন্যদিকে সৌন্দর্য, সৌরভ ও আনন্দের দ্যোতক। জীবনের অন্ধকার ও আলোকিত অংশ একই সঙ্গে ধরে রাখে ফুল। কবির কবিতায় ফুল কখনও সই বা সখীরূপে কখনও প্রিয়ারূপে ধরা দিয়েছে।

"আমরা আরো দেখেছি একরকম বনফুল
ছুঁলেই সে ফুল ঝরে যায়।"[৩৬]

('একটি অনুবাদ', 'প্রদোষের নীল ছায়া')

অসামান্য ক্ষমতা নিয়ে জন্মানো এত ভালোবাসা, এত প্রেম বিতরণের পরেও সামান্য আঘাতে ফুলের ঝরে যাওয়াতে কবি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মানসী কপালকুণ্ডলার মতো বনজাত ফুলের কথা বলতে চেয়েছেন যে নবকুমারের স্পর্শে অকালেই ঝরে গেছে। এখানে প্রকৃতিপ্রেম ব্যক্তিপ্রেমের দিকে এগিয়ে গেছে। আবার ব্যক্তিপ্রেমকে কবি পৌঁছে দিয়েছেন বিমূর্ত প্রেমে :

"নিঃশব্দ —
জল ভরণের শব্দ তোমার না
না বিচিত্রিত কলস না তোমার
না বিম্বিত ধ্বনিময়
বর্ণময় এ হৃদয়, বরং
এই বসন্তে
জলরঙের বিহ্বল ধরায় ভাসমান অথচ
বাতাসের উতল ধাক্কায়
এখনই ডুবে মরতে উন্মুখ।'[৩৭]

('এই বসন্তে', 'বসন্তের এই গান')

আপাদমস্তক জ্ঞানতাপস কবি ডুব দিতে উন্মুখ ‘এই বসন্তে’র ‘জলরঙের বিহ্বল ধারায়’, গাগরী বা কলসীতে জলভরার উদাত্ত শব্দ এখানে কবির কাছে ‘জলভরণ’ শব্দ, উচ্চকিত নয়, এমনকি গম্ভীর শব্দ প্রণয়ের মূর্ত শব্দবন্ধও নয় — কেবল অল্প অথচ স্থির কয়েকটি মুহূর্তের সুরেলা শব্দ হলো কবির ‘জলভরণ’। এখানে পরিণয় প্রেম নেই, প্রণয়ের সুদৃঢ় কথোপকথন নেই; আছে নৈঃশব্দের মিলন প্রত্যাশী আবেগ এবং অবশ্যই তা শরীর ব্যতিরেকে। এখানে রঙ আছে, বসন্তও আছে। বসন্তকাল রং এর কাল। ‘বসন্ত’ মানেই তো প্রাণ, প্রেম। কিন্তু বসন্তের চন্দ্রভাগা প্রবাহের লেশমাত্র নেই — অনুপস্থিত সৌন্দর্যের শরীরী আকর্ষণ। চিত্রশিল্পী জলরং এর ছবি আঁকতে গিয়ে ছবিকে বারবার ধুয়ে সম্পূর্ণ রং দেন, ছবিতে ব্যবহৃত রং এর চরিত্রকে কোমল করার জন্য। তাঁরা দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষার তাগিদ থেকে সরে আসেন অনুভূতির জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে। এখানে কবিও তাই করতে চেয়েছেন যা জলরং এর বিভল প্রবাহে দীপ্তিমান।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতার প্রেমচেতনায় ব্যক্তিগত প্রেম থাকলেও তা বহুত্ববাদী হয়ে উঠেছে। একটি প্রসঙ্গের সূত্রে অনুরূপ অনেক বিকল্প প্রসঙ্গ এসেছে অথবা একটি শব্দের সূত্রে বিকল্প অজস্র শব্দ এসে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশের প্রেম দ্বৈত, বীতশোক ভট্টাচার্যের প্রেম বহুত্ব। বৈষ্ণব কবিতায় একমুখী প্রেম, দেবতার প্রতি নিবেদন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় ব্যক্তিগত আকুতি পূজা নৈবেদ্য পর্যায়ে চলে গেছে। জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তিপ্রেম দেশাত্মবোধের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে, ইতিহাস, ভূগোলও সেখানে চলে আসে। কবি বীতশোকের প্রেমচেতনা বহুত্ববাদী চেতনা হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতা যেন একটা পোড়ামাটির শিল্প। যে শিল্পের ভেতরে শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন, দীর্ঘশ্বাস, স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন ধরা আছে। ভারতবর্ষের মানুষ, তাদের ভাবনা-চিন্তা সমস্ত কিছুই উঠে আসছে তাঁর কবিতায়।

তথ্যসূত্র

১। প্রেমের আভিধানিক অর্থ যাই হোক্ না কেন আধুনিককালে শব্দটি বিশেষার্থে ব্যঞ্জনার পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত হয়। প্রেমের মূলে কাম বিরাজিত থাকলেও প্রেম যে কাম নয়, তা একালে যেমন স্বীকৃত, প্রাচীনকালেও তেমনি গৃহীত হয়েছিল। প্রেমের প্রেরণা থেকেই মানুষের প্রথম কবিতা রচনা। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে সম্ভবত প্রথম প্রাচীনতম প্রেম কবিতা উচ্চারিত হয়েছে যেখানে পুরুরবা উর্বশীকে বলছেন:

'তবে তোমার প্রণয়ী অদ্য পতিত হোক, আর কখনও যেন উত্থিত না হয়। সে যেন বহুদূরে দূর হয়ে যাক। সে যেন নি:ঋতির অঙ্কে শায়িত হোক, বলবান বৃকগণ তাকে ভক্ষণ করুক।' তার প্রত্যুত্তরে উর্বশী বলছেন : 'হে পুরুরবা, এরূপে মৃত্যু কামনা কর না;... স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃক্ষের হৃদয় দুইই এক প্রকার'।

('ঋগ্বেদ সংহিতা', হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬)

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় , 'কবি এবং কবিতার বিষয়-আশয়', দে'জ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৩১৯।

২। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর 'পথপ্রান্তে' কবি বলেছেন: 'প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, এক হইতে আর একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র' কামিনী, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ২০১৫ জানুয়ারি, পৃ. ৩১৫

৩। 'আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রত্যেক প্রধান কবি নিজ নিজ কবিতায় প্রেম বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী বিশ্ববাসীর যুগল প্রেম কল্পনা, ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের অস্থিমাংস সম্বন্ধ প্রেমানুভূতি, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ক্ষণভঙ্গুর মিলন স্মৃতিকে স্থায়িত্ব দানের আকুতি, মোহিতলাল মজুমদারের দেহলগ্ন রতিবিমুখ প্রেমের ক্রন্দন ও হাহাকার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রেমকে অস্বীকার ও জীবন-যন্ত্রণাকেই প্রেমের স্থলাভিষেক, বুদ্ধদেব বসুর জৈবিক মিলনের নিঃসঙ্গ ও উতরোল আনন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমাজ ভীরু প্রেমের খিন্ন অবসাদ, ... জীবনানন্দের দৃষ্টিতেও প্রেম এক স্বতন্ত্র চেতনা।"

অম্বুজ বসু, 'একটি নক্ষত্র আসে', পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪২২ বৈশাখ,

পৃ. ৭৪।

৪। 'গতিশীলতা' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় যথার্থ প্রেমের স্থিরতা নেই। এই প্রেম সামনের দিকে চালাতে জানে এবং চলতে জানে।

৫। 'কোনো কবিতার বইয়ের ভূমিকার বদলে' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত 'অগ্রন্থিত কবিতা'য়। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'কবিতা সংগ্রহ'-এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা,কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৭২।

৬। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত),'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ','কুড়ি বছর পরে', 'ভারবী', কলকাতা, পৃ. ১৬৪।

৭। 'ফেরা' কবিতাটি 'নতুন কবিতা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। পরে কবির 'কবিতা সংগ্রহ'-এ স্থান পায়।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ' , এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৫০।

৮। জয় গোস্বামী, ,' উন্মাদের পাঠক্রম' , 'সৎকার গাথা', আনন্দ, কলকাতা, চর্তুদশ সংস্করণ ২০১৬, পৃষ্ঠা.১১৭

৯। 'দ্বিরাগমন' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে 'নীল এক পাতা' গ্রন্থে। পরে কবিতাটি কবির 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় স্থান পায়।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' , বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১১৩।

১০। 'বাচাল' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল বহুভাষী, প্রগলভ। অর্থাৎ যে বেশি কথা বলে। এ কথার মধ্যে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কথাও থাকে। এ কবিতায় কবি সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিক বাচালতার আশ্রয় নিয়েছেন।

১১। 'অধিকার' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে 'দ্বিরাগমন' গ্রন্থে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'কবিতা সংগ্রহ'-এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য,'কবিতা সংগ্রহ', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১০৬।

১২। 'দায়ভাগ' হিন্দুধর্মাবলম্বীদের অধিকার বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থটি জীমূতবাহনের লেখা।

১৩। মিতাক্ষর্ এর স্ত্রীলিঙ্গ মিতাক্ষরা। মিতাক্ষর →মিত + অক্ষর। 'মিত' কথার আভিধানিক অর্থ পরিমিত বা মাপা। আবার 'মিত' বলতে মিত্র বা বন্ধুকেও বোঝায়। 'মিতাক্ষর' অর্থাৎ স্বল্পাক্ষর, পরিমিতবর্ণ। মিতাক্ষর হল মিত্রাক্ষর যুক্ত ছন্দবিশেষ। যে ছন্দে শ্লোকের দুই চরণের শেষ দুই শব্দের অক্ষর একপ্রকার। –ক্ষর বি চরণের শেষ একরূপ অক্ষর। [বাঙলায় মিত্রাক্ষর ছন্দই অধীক। বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থাঙ্কে ও প্রাকৃতপৈঙ্গলে প্রাকৃতে এবং গীতগোবিন্দে ও মোহমুদ্গর প্রভৃতিতে সংস্কৃতে মিত্রাক্ষর দেখা যায়।]

'মিতাক্ষরা' হল সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যানগ্রন্থ।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, সপ্তম মুদ্রণ ২০০৮, পৃ. ১৭৮৭-১৭৮৮।

১৪। 'মধুসূদনের জন্যে' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'প্রদোষের নীল ছায়া' গ্রন্থে ২০০১ সালে। পরে কবির 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় স্থান পায়।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১১৩।

১৫। মেটোনিমি গ্রিক শব্দ। শ্যামাপদ চক্রবর্তী এর পরিভাষা করেন অনুকল্প। অনু অর্থাৎ পরে বা পশ্চাৎ। বিকল্প বলতে বোঝায় একাধিক রূপ বা বিভিন্ন কল্পনা। আসলে মূল শব্দটিকে বোঝানোর জন্য অনুক্রমানুসারে একাধিক বিকল্প শব্দ ব্যবহার করা যায়। এর ফলে লিখনটি গভীর থেকে গভীরতম অর্থের দিকে এগিয়ে চলে। একটি শব্দ বা বাক্যের অথবা সমগ্র কৃতিটির আপাত অর্থের সঙ্গে অনুকল্প শব্দ বা বাক্যের একটি সম্পর্ক থাকে অনেক দূরে। এখানে উৎপ্রেক্ষার 'মতো', 'যেন' ইত্যাদি তুলনাবাচক শব্দ থাকে না। আবার সম্ভাবনা – ভাব অনুমান করে উপমাও অনুপস্থিত এই বিদেশি অলংকারে। তাই একে (মেটা) meta অর্থাৎ পর এবং anoma অর্থাৎ নাম, থেকে Metonymy/ পরনাম বললে অলঙ্কারটির সুদীর্ঘমাত্রা বোধগম্য হয় না।

নিতাই জানা (সম্পাদিত), 'পোস্টমডার্ন বাংলা কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১২৬।

১৬। মধুকান নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন মধুসূদন কিন্নর। জন্ম ১২২৫ সাল, যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার উলুশিয়া গ্রামে। পিতা - তিলক চন্দ্র কিন্নর। বাল্যে বিদ্যাশিক্ষা না থাকলেও

নিজের যত্নে বাঙ্গালা পড়তে শিক্ষা করেছিলেন। লিখতে জানতেন না। কিন্তু তাঁর রচিত সঙ্গীতের শব্দবিন্যাস দেখলে তাঁকে বিদ্বান বলেই মনে হয়। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত রচনায় মন দেন। ঢাকার ছোট খাঁ বড় খাঁর কাছে রাগরাগিনী ও খেয়াল এবং রাধামোহন বাউলের কাছে ঢপ শিক্ষা করেন। ইনি মান, মাথুর, অক্রুর সংবাদ প্রভৃতি পালা রচনা করে। দল বেঁধে গান করতেন। তাঁর গানের শেষে 'সূদন' বলে ভনিতা আছে। মধুকানের গানের সুর অনেকটা রাগ রাগিনীর ভিত্তির উপর স্থাপিত। ৫৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দত্ত (সম্পাদিত), 'সরল বাংলা অভিধান', নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলিকাতা, ১৩২৩, পৃ. ৮৫৬।

১৭। পরমা সুন্দরী দেবী বিশেষ। বিশ্বের রমনীয় পদার্থগুলির তিল তিল অংশ নিয়ে একে সৃষ্টি করা হয় বলে এর নাম তিলোত্তমা। একে পাবার জন্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন দুর্ধর্ষ অসুর ভ্রাতৃযুগল সুন্দ ও উপসুন্দের মধ্যে লড়াই বাধে, ফলে উভয়ের ধ্বংস ও মৃত্যু হয়।

অম্বুজ বসু, 'একটি নক্ষত্র আসে', পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ১৪২২ পৃ. ৫৩৮।

১৮। বিনির্মাণ এর ইংরেজী প্রতিশব্দ ডিকনস্ট্রাকশন (Deconstruction)। ডিকনস্ট্রাকশন কোনো দর্শন নয়। সমালোচনার বিশেষ এক পদ্ধতি যে কোনো Text অর্থাৎ পাঠ বা কৃতির একমাত্র অর্থ অসম্ভব। যিনি লিখেছেন তাঁর এমন অনেক চেতনা ছিল যা লিখনে স্পষ্ট নয়। কিন্তু তাঁর ভাবনায় অথবা কথনে কিংবা উচ্চারণে ছিল। তাই উপস্থিত কৃতিকে তন্ন তন্ন (গ্রামার) বিচার করে ভেতরের দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে দেওয়া যায় এ পদ্ধতিতে। তখন ধরা পড়ে লিখনের প্রেজেন্স অফ মেটা ফিজিক্স বা আধিবিদ্যার উপস্থিতি। অর্থাৎ টেক্সট বা কৃতিটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিচার, তারপর কৃতির ভাষাকে টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলা। সেই টুকরো অংশের শব্দ অথবা প্রায় সম-উচ্চারিত ভিন্ন শব্দের সেল্ফ রিফ্লেকসিভনেশ থেকে পাওয়া পরস্পরবিরোধী অর্থের চাপে লেখক ও তাঁর কৃতিটিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা যায়। জাক দেরিদা এই কারণে একে বলেন ডিকনস্ট্রাকশন। আমরা এর পরিভাষা করি বিনির্মাণ। অর্থাৎ ভাষাকে ভেঙে, তন্ন তন্ন ভাবে বিচার করে কৃতির মূল বক্তব্যর পাশাপাশি বিপরীত অর্থ বা ইঙ্গিতকে তুলে ধরে বিশেষভাবে নির্মাণই বিনির্মাণ।'

নিতাই জানা , 'পোষ্টমডার্ন বাংলা কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১২১।

১৯। 'রাখালিয়া' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩৯৩-এ 'এসেছি জলের কাছে' গ্রন্থে। পরে কবিতাটি 'কবিতা সংগ্রহ'-এ স্থান পায়।

বীতশোক ভট্টাচার্য,'কবিতা সংগ্রহ' , এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৯৯।

২০। কৃষ্ণের বাঁশীর সুর শুনে আত্মহারা রাধা বড়াই-এর কাছে জানতে চান :

"কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।

কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।

বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ বান্ধন।।

কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি সে না কোন জনা।

দাসী হআঁ তার পা এ নিশিবোঁ আপনা।।

কেনা বাঁশী বা এ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।

তার পা এ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে।।

নীলরতন সেন (সম্পাদিত), 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', মূল পাঠের আধুনিক বঙ্গানুবাদ; সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩৫৭।

২১। চণ্ডীদাসের পদটি সমগ্রত এইরূপ :

"এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।

নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।।

সমুখে রাখিয়া করে বসনের বাও।

মুখ ফিরাইলে তার ভয় কাঁপে গাও।।

এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।

সুখের সাগরে ডুবি অবাধ না পাই।।

রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।

দেহ ছাড়ি মোর প্রাণ যেন চলি যায়।।

সেকথা বলিতে সই বিদরে-পরাণ।

চণ্ডীদাস কহে সই সব পরমাণ।।"

শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ৬৫-৬৬।

২২। "জীবাত্মা বলিতে স্খলন - চঞ্চল জীবনযাত্রীকে বুঝিতেছি না; – এ জীব ঈশ্বরময়, অনন্যনিষ্ঠ, গৃহত্যাগী, অন্তরে ও বাহিরে আলোকিত। প্রিয়তম বলিয়া ঈশ্বরকে ডাকিবার অধিকার এই জীব-ভক্তের আছে; এমন সমুচ্চ ভাবাত্মতায় তাহার অবস্থান যে, সেক্ষেত্রে ক্ষণমাত্র অদর্শনও 'কোটি বরষের অগ্নিদহন'। চণ্ডীদাসের রাধা শুদ্ধ সত্ত্বের বিকাশ, কিন্তু তাঁহার আত্মার শিখা মৃৎভাণ্ডে জ্বলিয়াছে।"

তদেব, পৃ. ১৭।

২৩। 'সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে মৃত্যুর অধিদেবতা যমের জন্ম। বিমাতা ছায়া তাঁর অযত্ন করলে ইনি তাঁকে পদাঘাত করতে যান, ফলে ছায়ার অভিশাপে পায়ে ক্ষত ও কীট হয়। সূর্য তখন এঁকে এক কুকুর দেন, সে ক্ষত নির্গত পূঁজ ও কীট খায়। ইনি দক্ষিণ দিকপাল ও জীবের পাপপুণ্যের বিচারক, যমী এঁর ভগিনী, মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত, আয়ূধ দণ্ড, বাহন মহিষী, দক্ষ প্রজাপতির ১৩টি কন্যার ইনি পানিগ্রহণ করেন। অনীমাশুব্য মুনির শাপে ইনি মর্ত্যে বিদুর রূপে জন্মান। যমের ঔরসে কুন্তির গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়।'

অম্বুজ বসু, 'একটি নক্ষত্র আসে', পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৫৩৮।

২৪। "যমুনা নদী বিশেষ। সূর্যকন্যা কালিন্দী। বেদোক্ত নদী এই নামে কয়েকটি নদী আছে। ১) উত্তর-ভারতের বিখ্যাত নদী, এর তীরে আগ্রা, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি অবস্থিত। প্রয়াগ তীর্থে এই নদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ২) ব্রহ্মপুত্র নদের নিম্নাংশ যা পদ্মার সঙ্গে মিলে মেঘনা নামাঙ্কিত হয়েছে। ৩) ইচ্ছামতীর অংশবিশেষ সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে গঙ্গাসাগরে পড়েছে। ৪) আসামের নদী বিশেষ। ৫) দিনাজপুর জেলায় প্রবাহিত নদী বিশেষ।"

তদেব, পৃ. ৫৩৮।

২৫। 'কোজাগরী' কবিতাটি 'নীল এক পাতা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য়।

বীতশোক ভট্টাচার্য : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৫৮।

২৬। পূর্বতন ছোটনাগপুর প্রদেশের অন্তর্গত সরগুজা রাজ্যের অধুনা উত্তরপ্রদেশের অন্তর্ভূক্ত রামগড় পাহাড়ের উপরে যোগীমার গুহায় প্রাপ্ত তিনছত্রের প্রস্নলিপিটি হল :

'শুতনুক নম দেবদশিক্যি
তং কময়িত বলন শেয়ে
দেবদিনে নম লুপদখে।'

'সুতনুকা নামে দেবদাসী / তাহাকে কামনা করিয়াছিল বারাণসীবাসী / দেবদিন্ন নামে রূপদক্ষ।'

শ্রী সুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১২৩।

২৭। 'বন্দনা' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯৯১-এ 'অন্যযুগের সখা' গ্রন্থে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য়।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২১।

২৮। 'রাত্রে' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯৯১-এ 'অন্যযুগের সখা' গ্রন্থে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'কবিতা সংগ্রহ'-এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৪।

২৯। 'দ্বিরাগমন' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'দ্বিরাগমন' গ্রন্থে ১৯৯৭ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় কবিতা সংগ্রহ-এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১১৭।

৩০। 'অন্তর্জলি' কবিতাটি 'অগ্রন্থিত কবিতা'য় প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় ঐ সময়ে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য়।

বীতশোক ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ কবিতা, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১২৮।

৩১। 'মাতৃভাষা' কবিতাটি ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা সংকলন 'অগ্রন্থিত কবিতায়' প্রকাশিত হয়। পরে কবিতাটি 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় স্থান পায়।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৮৫।

৩২। 'হারমোনিয়াম' কবিতার অংশ :

"তোমার নিজের মাকে তোমার আজ ভালো মনে নেই।
এইটুকু মনে আছে একবার বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে
উঠোনের দিকে চেয়ে, একবার বিকেলের আকাশের দিকে
তারপর তোমার ওই মুখের ওপাশে চেয়ে গান গেয়েছিল;
....
মায়ের পরণে ছিল ফুল ফুল নীল শাড়ি,
স্মৃতিটুকু থেকে গেছে, আলতো আঘাত ঝরে চোখ মুখ নাকের ওপরে।"

কবির 'হারমোনিয়াম' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে 'নতুন কবিতা' গ্রন্থে। পরে কবিতাটি স্থান পায় কবিতা সংগ্রহ-এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৫৩।

৩৩। 'ফেরি' কবিতার শেষ অংশে আছে :

"তোমার মুখের রেখা যেন রুগ্ন শুশ্রূষার ভাঙচুরে ছোঁয়
আমার মায়ের মুখ.....।"

'ফেরি' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'শিল্প' গ্রন্থে ১৯৮৬ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'কবিতা সংগ্রহ'এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', 'এবং মুশায়েরা', কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৭৫।

৩৪। 'বার্ষিকী' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'প্রদোষের নীল ছায়া' গ্রন্থে ২০০১ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য়।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১০৭।

৩৫। 'অন্ধবালিকা' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'অন্যযুগের সখা' গ্রন্থে ১৯৯১ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'কবিতা সংগ্রহ'-এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', 'এবং মুশায়েরা', কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৫।

৩৬। 'একটি অনুবাদ' কবিতাটির প্রকাশকাল ২০০১, 'প্রদোষের নীল ছায়া' গ্রন্থে। পরে এটি 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় স্থান পায়।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১০৫।

৩৭। 'এই বসন্তে' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'বসন্তের এই গান' গ্রন্থে ২০০১ সালে। পরে কবিতাটি 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় স্থান পায়।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১০৩।